

প্রতিবাদীদের উগ্রপন্থী তকমায় দেগে দিতে চান প্রধানমন্ত্রী

৭৯ বছর ধরে স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার প্রাচীর থেকে প্রধানমন্ত্রীদের অমৃতবাণী কম শুনল না দেশ! বর্তমান নরেন্দ্র মোদিই ১২ বার এই উপলক্ষে ভাষণ দিয়ে ফেললেন। প্রতিবারই তিনি নতুন নতুন চমক সামনে আনেন, চমক না দিতে পারলে সেই একই কথার চর্বিত-চর্বন মানুষ শুনবেই বা কেন? এবারের ভাষণে মোদিজির চমক ছিল একদিকে ‘শক্তির সপ্তধারা’, অন্যদিকে ‘দিমাগি নকশাল’। গত পাঁচ সাত দশকে যে কাজ হয়নি, তিনি আগামী পাঁচ সাত বছরে তা করে ফেলার সংকল্প করেছেন। দেশের যত সমস্যা নাকি ওই সময়েই জন্ম নিয়েছে! যদিও, তিনি নিজেই গদিতে আসীন হয়ে রয়েছেন, এক দশকের বেশি। ১২ বছরে যা পারলেন না, আগামী পাঁচ সাত বছরে তা করে ফেলবেন, এমন গ্যারান্টি বা মোদিজি কী করে দিচ্ছেন? এই কারণেই কি ‘বিকশিত ভারতের’ লক্ষ্য তিনি ২০৪৭ পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছেন?

নরেন্দ্র মোদি কোনও প্রশ্নের উত্তর দেন না, ফলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়াও সম্ভব নয়। অবশ্য প্রশ্ন করাও বিপদের— ‘দিমাগি’ অর্থাৎ মন বা চিন্তাকেই যখন নকশালবাদের মতো উগ্রপন্থার আঁতুড় বলে দেগে দেন খোদ প্রধানমন্ত্রী, তাঁর পারিষদবর্গের কাছে যে বার্তা পৌঁছে যায় তার সাথে সদ্য পরিচয়

হয়েছে প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছাত্র-যুব সমাজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কথিত ‘শক্তির সপ্তধারা’ খুঁটিয়ে দেখতে গেলেই যে মনে প্রশ্ন আসতে বাধ্য। দেশের হাল যা তাতে শ্রমিক-চাষি-অফিস কর্মচারী-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-হকার — দেশের সব স্তরের রামা কৈবর্ত-হাসিম শেখরা প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সিপাই-সাত্ত্বীদের ভয়ে সব কিছু মেনে নিয়ে নিজের ‘দিমাগি’-কে যতই ঠাণ্ডা থাকতে বাধ্য করার চেষ্টা করুন না কেন, পেট যে বুঝবে না! আধপেটা খাওয়া সন্তানের সামনে মনকে শান্ত রাখবেন তাঁরা কী দিয়ে? বিজেপি সরকারের রেকর্ড বলছে, প্রশ্ন করার জন্য দেশদ্রোহী তকমা পেয়েছেন একাধিক সাংবাদিক। প্রশ্ন তোলার অপরাধে খুন হয়েছেন সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ, সমাজকর্মী গোবিন্দ পানসারে, নরেন্দ্র দাভোলকর। সংবাদমাধ্যম সরকারের বিরুদ্ধে কলম ধরায় তার সম্পাদক গ্রেপ্তারের মতো ঘটনাও বিরল নয়। তা হলে প্রশ্ন তুললেই ‘নকশাল’ তকমা লাগানোর হুমকি নতুন করে কাদের দিলেন প্রধানমন্ত্রী? প্রতিবাদী যুব সমাজকে নয় কি! স্বাধীনতার ৮০ বছর উদযাপনে ভারতবাসীর কাছে সরকারের বিশেষ বার্তা — সরকারের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলো না, মাথা নিচু করে সব অন্যায় মেনে নিজে

দুয়ের পাতায় দেখুন

উচ্চশিক্ষায় দলীয় নিয়ন্ত্রণের পুরনো ধারা তীব্র প্রতিবাদ এসইউসিআই(সি)-র

রাজ্যের কলেজগুলির গভর্নিং বডির সভাপতি পদে দলের বিধায়ক ও সাংসদদের বসিয়ে উচ্চশিক্ষায় দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েমের প্রতিবাদ করল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৩ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, গতকাল পশ্চিমবঙ্গের ২৪৭টি কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি পদে দলের বিধায়ক ও সাংসদদের বসিয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েমের হীন পদক্ষেপ নিল রাজ্যের বিজেপি সরকার। এই পদক্ষেপ কলেজগুলির স্বাধিকার, গণতান্ত্রিক ও সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মস্ত বাধা হিসেবে দেখা দেবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান মনুষ্যত্বের উপর সর্বাঙ্গিক আক্রমণের পরিকল্পনা সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০কে জবরদস্তি চালু করার পথে এটি একটি স্বৈরাচারী পদক্ষেপ।

এর মাধ্যমে রাজ্যের পূর্বতন তৃণমূল ও সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলবাজির অগণতান্ত্রিক পদাঙ্ক অনুসরণ করল বিজেপি সরকার। শুধু তাই নয়, সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গেল তারা। দেখা যাচ্ছে কোনও দলের সরকারই দলীয় আনুগত্য ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি বা সদস্য হিসাবে কোনও ব্যক্তিকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

১৯৪৬-এর দাঙ্গা স্মৃতিচারণ না ঘৃণাভাষণ

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে আয়োজিত হয়েছিল ‘আগস্ট ১৯৪৬-এ গণহত্যার স্মৃতিচারণ’ শীর্ষক এক বক্তৃতা-সভা। মঞ্চ আলোকিত করে বক্তব্য রেখেছেন রাজ্যপাল আর এন রবি। তাঁর সেই বক্তৃতা সরকারি উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, হঠাৎ ২০২৬ সালের আগস্ট মাসে ৮০ বছর আগের সেই ১৯৪৬-এর দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির ঘটনাকে এই ভাবে স্মরণ করার প্রাসঙ্গিকতা কী? এ শুধুই কি ইতিহাস চর্চা? যদি তাই হত, তা হলে তো এই সভায় বক্তা হিসেবে স্থান পাওয়ার কথা ছিল প্রথিতযশা ইতিহাসবিদদের, যারা সেই সময়ের ইতিহাস নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা করেছেন বা তার চর্চায় এখনও রত। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল একজন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ কিংবা ওই সময়ের ইতিহাস চর্চায় তাঁর কোনও বিশেষ অবদান রয়েছে— এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তা হলে কীসের ভিত্তিতে এ রকম একটি ইতিহাসনির্ভর সভায় তিনি প্রধান বক্তার স্থান অধিকার করার উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হলেন? কেবল তাঁর পদ আর শাসক দলের বশব্দ হওয়ার যোগ্যতায়? এ প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক মহল, ইতিহাসবিদ থেকে শুরু করে নানা অংশ থেকে উঠছে।

রাজ্যপাল তাঁর বক্তব্যে সুস্পষ্ট ভাবে বলেন যে, ১৯৪৬ সালের ১৬-১৯ আগস্ট তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সুরাভী ও তাঁর সহকারীদের প্রত্যক্ষ মদতে এই গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। ওই চার দিনে দশ হাজার হিন্দু

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজের জমিদারি বানাতে চায় বিজেপি



যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সাধারণ সভা (জিবি) ডাকাকে কেন্দ্র করে ১৯ আগস্ট রাতে বিবাদ হয় ডিএসএফ নামে একটি সংগঠন এবং আরএসএস-এর ছাত্র শাখা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি)-র মধ্যে। এর জেরে বচসা ও সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেই রাতেই এবিভিপি-র সদস্য ও বাইরের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে এক বিজেপি বিধায়ক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে যাদবপুরের ছাত্রদের হুমকি দিয়ে নানা মনগড়া অভিযোগ তুলে যাদবপুরকে দেশবিরোধীদের আখড়া বলতে থাকেন। কয়েক জনের নাম করে তাঁর হুঁশিয়ারি, এক ঘণ্টার মধ্যে এঁরা আত্মসমর্পণ না করলে, যেখানে লুকিয়ে আছেন,

থাকা ঐতিহ্যবাহী প্রতীক ভেঙে ফেলা হয়। কিন্তু এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে, যখন ছাত্রছাত্রীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দীর্ঘ সময় ধরে নৈরাজ্য চললেও উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের দেখা মেলেনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তাকর্মীদেরও কোনও সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। প্রশ্ন উঠেছে, তা হলে কি প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থেকে এবিভিপি/বিজেপির তৈরি করা এই নৈরাজ্য চলতে দিল? আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল, পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এবং বিজেপি-এবিভিপির দীর্ঘদিনের

চারের পাতায় দেখুন

দেগে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

একের পাতার পর

‘দেশপ্রেমিক’ প্রমাণ করো।

প্রধানমন্ত্রীর সপুথারা কী? উৎপাদন শক্তি, কৃষি শক্তি, প্রযুক্তি শক্তি, গতি শক্তি (উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা), আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা, পরিবেশবান্ধব ও সমুদ্রবান্ধব অর্থনীতি (গ্রিন-ইকোনমি ও ব্লু-ইকোনমি), এবং মেধা ও কৃষ্টি শক্তি— এই সপু-শক্তির ধারায় আর্থিক সংস্কার করে যুবশক্তি, নারীশক্তি ও কৃষক-শ্রমিককে এগিয়ে নিয়ে যাবেন নাকি তিনি! প্রধানমন্ত্রী বিশেষ জোর দিয়ে ‘সংস্কার’ শব্দটা ব্যবহার করেছেন। এই আর্থিক সংস্কার শব্দটি এখন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে আতঙ্কের। মানুষ জানে সংস্কার মানেই নতুন কোনও আর্থিক আক্রমণের ভূমিকা। অন্য দিকে সংস্কারের ঘোষণাতে দেশি বা বিদেশি বৃহৎ পুঁজি মালিকদের মন ভরে যায় খুশিতে।

মোদিজি কথিত সপু-শক্তিদ্বারার প্রথমটি হল ‘উৎপাদন শক্তি’। কী সেটা? আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতার শক্তি বাড়াতে যন্ত্রাংশের পাশাপাশি সম্পূর্ণ পণ্য উৎপাদন এবং রপ্তানি বাড়াতে উৎপাদন খরচ কমানো, পণ্যের গুণমান বৃদ্ধি ও সর্বোপরি প্যাকেজিং-এর উপর জোর দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী যতই রাগ করুন, প্রশ্ন না করে উপায় নেই— দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে মানুষের কেনার ক্ষমতা বাড়ানো ও তাদের জন্য পণ্য উৎপাদনের কী হবে? উৎপাদন খরচ কমাতে কাঁচামাল, বিদ্যুৎ ইত্যাদির দাম যখন কমার আশা নেই, উৎপাদন খরচ কমানোর একমাত্র উপায় শ্রমিকের প্রাপ্যে কোপ বসানো! আন্তর্জাতিক মানের পণ্য তৈরি করতে শ্রম নিবিড় শিল্পের ঝাঁপ বন্ধ করে পুরোপুরি পুঁজি-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে বৃহৎ মালিকদের বিপুল মুনাফা হবে সন্দেহ নেই। উৎপাদন শক্তিদ্বারা বল জোগাবে দেশি একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের, কিন্তু দেশের কোটি কোটি কাজ হারানো শ্রমিকের বেঁচে থাকার শক্তি যে ফুরিয়ে যাবে! মোদিজি কি জানেন, দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে শুরু করে সমস্ত উৎপাদন খাতে বৃদ্ধি গত তিনমাসে কমতে কমতে একেবারে তলানিতে নেমেছে! দেশের অধিকাংশ মানুষের রোজগারের বড় অংশই চলে যায় খাদ্য জোগাড়ে, তারা শিল্পদ্রব্য কিনবে কী করে? প্রধানমন্ত্রী এ জন্যই শুধু রপ্তানিতেই পড়ে রইলেন?

দ্বিতীয় হল ‘কৃষি শক্তি’। এই ধারায় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মধ্য দিয়ে ভারতের খাদ্য, ফল, মশলা, সজ্জিক্ত বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডে পরিণত করতে কৃষি ক্ষেত্রে বিপুল সংস্কার হবে। অর্থাৎ কৃষিতে বৃহৎ পুঁজিকে ঢোকার অধিকতর সুযোগ করে দেওয়ার রাস্তা হবে। প্রশ্ন করতেই হয়— এ ধারা শক্তি জোগাবে কাকে? কৃষক না একচেটিয়া পুঁজি মালিককে? মোদিজির ভোলার কথা নয়, পাঁচ বছর আগে তাঁর সরকারের আনা এই রকম ধারার তিন কৃষি আইন রুখতে সাতশোর বেশি অন্নদাতা কৃষক দিল্লির সীমান্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে গেছেন। মোদিজি তাঁদের কটাক্ষ করে খালিস্তানি, আন্দোলনজীবী, টুকরে টুকরে গ্যাং ইত্যাদি কত কিছু বলেছেন। তাঁরা কিন্তু ভয় পাননি। এখন দিমাগি নকশাল তকমার ভয়ে তাঁরা পিছিয়ে যাবেন, এমন আশাই কি করছেন মোদিজি? ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি, ল্যাটিন আমেরিকার কিছু দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কিংবা ব্রিটেন ও ইউরোপীয়

ইউনিয়নের সাথে ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার স্বার্থে? মোদিজি বলুন পরিষ্কার করে! কৃষকরা বলছেন, এই চুক্তির জোরে ডেয়ারি পণ্য, ফল, ডাল, তৈলবীজ সহ নানা কৃষিপণ্য বিদেশ থেকে অবাধে ভারতে ঢুকবে। আমদানি করবে মোদিজিদের ঘনিষ্ঠ বৃহৎ কোম্পানির মালিকরা। জীবিকা হারাবে ভারতের সাধারণ কৃষক। অন্য দিকে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি মালিকরা চাষের জমি থেকে শুরু করে ফসলের বাজার পর্যন্ত দখল করবে পুরোপুরি। চাষি হবে তাদের মজুর, না হয় চুক্তি-বন্ধ ঠিকাদার। আন্তর্জাতিক বাজারে মোদিজি কথিত চকচকে প্যাকেজিং মোড়া ‘ভারতীয় ব্র্যান্ডের’ ফসলে কোটি কোটি কৃষি মজুর-চাষির চোখের জল আর রক্তের দাগ ঢাকবেন কী দিয়ে? অবশ্য প্রশ্ন না করে চাষিরা দিনে দিনে আত্মহত্যার তালিকায় নতুন নতুন সংখ্যা যোগ করলে তাদের ‘দিমাগ’ নিয়ে বিজেপি সরকারের কোনও আপত্তি নেই! স্বাধীনতার ৮০ বছরে স্বদেশি কৃষককে অপূর্ব উপহার!

বাকি পাঁচ শক্তিদ্বারা হল — প্রযুক্তি, ‘বিকশিত ভারত’ গড়তে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা, পরিবেশবান্ধব ও সমুদ্রবান্ধব অর্থনীতি এবং ‘সফট পাওয়ার’ (মেধা ও কৃষ্টি শক্তি) গড়ে তুলতে যোগব্যায়াম, হস্তশিল্প, গেমিং, ডিজিটাল কন্টেন্ট ইত্যাদি তৈরির ধারা। প্রযুক্তির জন্য ডেটা সেন্টার, ডিজিটেল কমিউনিকেশন, রোবোটিক্স ইত্যাদির জোরে দেশকে লম্বা লাফ দিতে বলেছেন মোদিজি। প্রশ্ন হল, লাফটা দেবে কে? দেশের তরুণ সমাজের হাতে তো দিন গুজরানোর মতো বেতনের কাজই নেই। তারা কী করে এই সব দামি প্রযুক্তি ব্যবহার করবে? আত্মনি, আদানি সাহেবদের মতো কিছু ধনকুবের আর তাদের উচ্চবেতনের কিছু কর্মচারী, সাথে হাজার কতক অতি ধনীরাই হল একমাত্র ভারতবাসী?

যোগাযোগ শক্তিদ্বারা! দেশে ব্রিজ থেকে সড়ক যোগাযোগ, বিমান পরিষেবা, বিমানবন্দর, জাহাজ শিল্প ইতিমধ্যে চলে গেছে বিশেষ কতগুলি কোম্পানির কজায়। রেলও সেই পথে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী কর্পোরেট মালিকদের হাতে পরিকাঠামো তৈরির ভার তুলে দিয়ে ‘স্পেস টেকনোলজি’ দিয়ে রাস্তা বানানোর বড়াই করেন। অথচ, রোজ জাতীয় সড়ক থেকে ব্রিজ ভেঙে পড়ছে। সরকারি বিমান পরিষেবা বেসরকারি হওয়ার পর এখন প্রায় প্রাণ হতে যাত্রীদের যাতায়াত করতে হয়। পরিবেশবান্ধব, সমুদ্রবান্ধব শক্তিদ্বারা নিয়ে বলার সময় মোদিজির টেলিপ্রম্পটারের পর্দায় যাই লেখা থাক, মনের পর্দায় কি আন্দামান নিকোবরের লক্ষ লক্ষ গাছ, সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করে আদানিদের সর্বনাশা প্রকল্প, আরাবল্লি পাহাড় বেচে দেওয়া, খনির অজুহাতে ধ্বংসের পথে চলা ওড়িশার নিয়মগিরি থেকে শুরু করে মধ্যপ্রদেশের পাহাড় জঙ্গলের কথা ভেসে উঠেছিল? উত্তরাখণ্ডের ‘দেবভূমি’তে পরিবেশ ধ্বংসের জন্য বিজেপি সরকারের আসুরিক কাজকর্ম মনে পড়ে যাওয়াতেই এবারের ভাষণে তাঁর খেই হারিয়েছিল কি না, তিনিই বলতে পারবেন। এ দিকে যোগব্যায়াম, গেমিং আর কন্টেন্ট বানিয়ে দেশের কোটি কোটি কর্মহীন যুবক-যুবতীদের রোজগারের পথ বাতলানো বেশ উন্নত কল্পনাশক্তির ফসল হলেও তাতে বাস্তবের চিঁড়ে যে একেবারেই ভেজে না!

এই অপূর্ব ‘শক্তিদ্বারা’ ৮০ বছরের স্বাধীন

দেশের ভবিষ্যত হলে, সে দেশের ছাত্র-যুবকদের চিন্তাশক্তি (মোদিজি কথিত ‘দিমাগ’) শাসকদের কাছে গভীর উদ্বেগের বিষয় হতে বাধ্য। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী চিন্তাশক্তিকে নকশালবাদের সারিতে ফেলতে চেয়েছেন। সরকার বিপাকে পড়লেই প্রতিবাদীদের গায়ে সন্ত্রাসবাদী তকমা লাগায়। কৃষক বিক্ষোভকে যেমন খালিস্তানি তকমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় বামপন্থী নামধারী রাজ্য সরকারও তাতে মাওবাদের ভূত খুঁজতে নেমেছিল। আজ দেশের মধ্যে নকশালবাদ বাস্তবে বড় কোনও সমস্যা নয়। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করা, প্রশ্ন তোলা হলেই তার গায়ে নকশাল তকমা লাগানো পিছনে আছে সরকারের কুমতলব। তাঁরা জানেন, বেকারত্বে জর্জরিত, ভবিষ্যতের দিশা দেখতে না পাওয়া যুব সমাজ তাঁর বিকশিত ভারতের ফাঁকা বুলিতে ভুলবে না। সাম্প্রতিক ছাত্র-যুব আন্দোলন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কী বিপুল বিক্ষোভের বারুদ আজ যুব সমাজের মনে জমা হয়ে আছে। তাঁরা এর থেকে মুক্তির পথ খুঁজছেন। শাসকদের ভয় হল, এই যুব সমাজ আজ না হয় কাল ঠিক বুঝবেন বিদ্যমান শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ। তাঁরা তা বদলের রাস্তাও খুঁজবেন এটাই স্বাভাবিক। মার্ক্সবাদের প্রকৃত উপলব্ধির ভিত্তিতে লড়াই বামপন্থাই তাঁদের এই পথ দেখাতে পারে। এর সন্ধান পেলে যুব সমাজ চর্চা করবে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা এবং যুক্তিবাদের। অলৌকিক, নন-বায়োলজিকাল নেতার ভাবমূর্তিকে তারা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে। সাম্প্রদায়িকতা, কুপমণ্ডুকতা, ধর্মীয় অন্ধতা, মৌলবাদের কবর খুঁড়বে তারা। তাই বামপন্থাকেই ভয় শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও বামপন্থার অমোঘ শক্তিকে কোনও শাসক অস্বীকার করতে পারে না, তাই তারা চেষ্টা করে বামপন্থাকে বিকৃত মোড়কে তুলে ধরার। এই কারণে বামপন্থার নাম করে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রকৃত রাস্তা ছেড়ে অর্থহীন উগ্রপন্থার রাস্তা নেয় যে মুষ্টিমেয় জনবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী, তাদের সবচেয়ে বেশি প্রচার দেয় কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম। সরকারও তাদেরই বামপন্থার প্রধান মুখ বলে তুলে ধরে। এতে একদিকে তাদের দমনের অজুহাতে যে কোনও গণআন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করার সামাজিক ছাড়পত্র শাসকরা আদায় করে নিতে পারে। একই সাথে এই দমন-পীড়নকে দেখিয়ে প্রতিবাদী যুব সমাজকে ভয় দেখাতে পারে শাসক শ্রেণি। এর সাথে শাসকরা প্রচার দিয়ে সামনে আনে সংস্কারবাদী, ভোট সর্বস্ব বামপন্থী নামধারী শক্তিগুলিকে। সংবাদমাধ্যম এবং সরকার এদেরও যথাসাধ্য মানুষের সামনে আনতে চায়, যাতে প্রকৃত লড়াই বামপন্থাকে মানুষের চোখ থেকে আড়াল করার সুবিধা হয়। উগ্র নকশালবাদ কিংবা ভোট সর্বস্ব সংস্কারবাদ বামপন্থার নাম নিলেও এই দুই দলের কেউই রাষ্ট্রশক্তির কাছে বড় কোনও বিপদ নয়। শাসকের কাছে বিপদ হল, যুব সমাজের মধ্যে যুক্তি বিজ্ঞান ও উন্নত চিন্তার চর্চার প্রসার। যে প্রসার হলে প্রকৃত লড়াই বামপন্থার জমি তৈরি হয় দেশে। যে কারণে লাল কেল্লা থেকে দিমাগ বা চিন্তা-ভাবনার শক্তিকে, আদর্শবাদ, যুক্তিবাদকে শেষ করার হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন প্রধানমন্ত্রী। ‘নকশাল’ শব্দটা তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর আসল উদ্দেশ্যকে আড়াল করতে।

অবশ্য এমন চেষ্টা শাসকরা এই প্রথম করছে না, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আদর্শকে, যুক্তিবাদী চিন্তাকে মারার চেষ্টা চলছে বহু বছর ধরে। মোদিজি জেনে রাখলে ভাল করবেন, তাঁর থেকে শক্তিশালী

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার খাকুডা-জাঙ্গালিয়া এলাকার প্রবীণ নেতা কমরেড রাসবিহারী সরদার ২৯ জুলাই ৮৫ বছর বয়সে বারুইপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।



১৯৬০ সাল নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রয়াত বিশিষ্ট নেতা কমরেড পাঁচু নস্করের সান্নিধ্যে এসে তিনি দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে তৎকালীন জোতদারদের বিরুদ্ধে ও পরবর্তীকালে কংগ্রেস-সিপিএম-তৃণমূল-বিজেপি পরিচালিত সরকারগুলির নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তিনি জনসাধারণকে সংগঠিত করার প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন। পারিবারিক জীবন থাকলেও তিনি সর্বক্ষেত্রের কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। সদাহাস্যময় বিদ্রোহী দরদি মন, সাদাসিধে জীবনযাত্রার জন্যে তিনি সাধারণ মানুষের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। বহু বছর তিনি দলের জাঙ্গালিয়া লোকাল সম্পাদকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ১৯৭৮ সাল থেকে তিনি বেশ কয়েকবার পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর সততা ছিল প্রশ্নাতীত। জনস্বার্থে ক্লাস্ট্রিন কাজকর্ম এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিটি আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। গণদাবী সহ পার্টির পুস্তক জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার কাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করে গিয়েছেন। দলের স্বার্থে ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালনেও দ্বিধা করতেন না। তাঁর চেয়ে বয়সে ছোটদের নেতৃত্বেও অনায়াসে কাজ করতে পারতেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের নেতা-কর্মীরা এবং এলাকার সাধারণ মানুষ উপস্থিত হন। দলের রাজ্য সম্পাদক, পলিটবুরো সদস্য চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষে, জেলা আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ ও গণসংগঠনগুলির পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

১৬ আগস্ট প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বহু মানুষের উপস্থিতিতে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নন্দ কুণ্ডু ও তরুণ নস্কর তাঁর চরিত্রের উজ্জ্বল দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন ডাঙর নিরঞ্জন নস্কর। এ ছাড়া দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড নিরঞ্জন নস্কর ও গোপাল সাহা উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড রাসবিহারী সরদার লাল সেলাম

শাসক হিটলার পর্যন্ত এ কাজে ব্যর্থ হয়েছে। তিনিও হবেন তা নিশ্চিত বলা যায়।

১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লিগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে একটি কর্মসূচি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। রচনার দায়িত্ব নেন লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। প্রথম খসড়াটির নাম রাখা হয়েছিল, ‘কনফেশন অফ ফেথ’। এই খসড়াটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রমোত্তরে লেখা বর্তমান রচনাটি দ্বিতীয় খসড়া রূপে এঙ্গেলস তৈরি করেন। কমিউনিজমের আদর্শকে সহজ ভাষায় বোঝাবার জন্য প্রমোত্তর রূপে লিখলেও, এঙ্গেলস এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৮৪৭-এর ২৩ নভেম্বর মাস্ত্রুকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন— প্রমোত্তরে লেখাটির উপর একটু ভাবনা-চিন্তা করো। আমার মনে হয়, এ ভাবে চলবে না। ইতিহাসের ঘটনাবলি কিছু যুক্ত করেই এটা দাঁড় করাতে হবে এবং নামও হওয়া উচিত ‘কমিউনিস্ট ইস্তাহার’। ১৮৪৮ সালেই প্রকাশিত হয় মাস্ত্রু-এঙ্গেলস রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার। সুতরাং বর্তমান প্রমোত্তরের লেখাটিকে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের খসড়া হিসাবেই দেখতে হবে। ৫ আগস্ট এঙ্গেলসের ১৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা লেখাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করছি। এ বার চতুর্থ কিস্তি।

**প্রশ্ন : এই নতুন সমাজব্যবস্থাকে
কেনম হতে হবে ?**

উত্তর : এই নতুন সমাজ সর্বপ্রথমে, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের হাত থেকে শিল্প এবং উৎপাদনের সমস্ত শাখার পরিচালনার ভার কেড়ে নেবে। এর বিপরীতে নতুন সমাজব্যবস্থা উৎপাদনের সমস্ত শাখাকে সামগ্রিকভাবে পরিচালনা করবে সামাজিক কর্তৃত্বে। অর্থাৎ সমাজের সকল সদস্যের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সামাজিক কল্যাণের জন্য

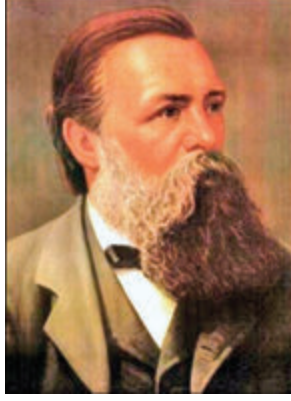
সামগ্রিক পরিকল্পনা অনুসারে তা পরিচালিত হবে। এর মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটে আসবে সম্মিলিত প্রয়াস। ব্যক্তির দ্বারা শিল্প পরিচালনার অবশ্যস্বার্থী ফল ব্যক্তি মালিকানা। যেহেতু ব্যক্তি মালিকদের শিল্প চালাবার ধরনই হল পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা, তাই শিল্পের ব্যক্তিগত পরিচালনা এবং প্রতিযোগিতা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানাকে আলাদা করা যায় না। কাজেই ব্যক্তিগত মালিকানারও অবসান ঘটাতে হবে। তার জায়গা নেবে সর্বসাধারণের দ্বারা উৎপাদনের সমস্ত হাতিয়ারের ব্যবহার এবং সর্বসাধারণের সম্মতির ভিত্তিতে সমস্ত উৎপাদনের বন্টন। যাকে বলা হয় দ্রব্যসামগ্রীর যৌথ মালিকানা। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তি মালিকানার বিলুপ্তিই হল গোটা সমাজের বৈশ্ববিক রূপান্তর যা বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশের ফলে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনার সংক্ষিপ্ততম এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ। কমিউনিস্টরা সঠিক ভাবেই ব্যক্তি সম্পত্তি বিলুপ্তির দাবিকে তাদের প্রধান দাবি হিসাবে তুলে ধরেছে।

**প্রশ্ন : ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ কি
এর আগে সম্ভব ছিল না ?**

উত্তর : না। সমাজব্যবস্থার প্রত্যেকটা পরিবর্তন, মালিকানা সম্পর্কের প্রত্যেকটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন হল নতুন নতুন উৎপাদিকা-শক্তি সৃষ্টি হওয়ার অপরিহার্য ফল। এই নতুন উৎপাদিকা-

সাম্যবাদের মূল নীতি

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস



শক্তি পুরনো মালিকানা সম্পর্কের সঙ্গে আর মানানসই থাকে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবও এই পথেই হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি চিরকাল ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগের শেষের দিকে চালু হয়েছিল এক নতুন উৎপাদনব্যবস্থা, সেটা হল ম্যানুফ্যাকচার (ছোট কারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থা)। তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক আর গিল্ডের

সম্পত্তির সঙ্গে এই উৎপাদন সম্পর্ক খাপ খাচ্ছিল না। এই উৎপাদন পদ্ধতি পুরনো মালিকানা সম্পর্কের পরিধিকে ছাপিয়ে গিয়ে জন্ম দিল নতুন ধরনের মালিকানা— ব্যক্তিগত মালিকানা। ম্যানুফ্যাকচার এবং বৃহদায়তন শিল্প গড়ে ওঠার প্রথম পর্যায়ের কালে ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়া কোনও ধরনের মালিকানা সম্ভব ছিল না। এই ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নতুন সমাজব্যবস্থা ছাড়া অন্য সমাজব্যবস্থাও সেদিন সম্ভব ছিল না।

যত দিন পর্যন্ত সকলের চাহিদা মেটানোর মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদনকে ছাপিয়ে গিয়ে সামাজিক পুঁজির বৃদ্ধি এবং উৎপাদিকা শক্তির আরও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভূত উৎপাদন সম্ভব না হয়, ততদিন পর্যন্ত সমাজে একটা প্রভুত্বকারী শ্রেণি সর্বদাই থাকে। যে শ্রেণি সমাজের উৎপাদিকা-শক্তিসমূহের পরিচালক, আর থাকে একটি দরিদ্র উৎপাদিত শ্রেণি। উৎপাদনব্যবস্থার বিকাশের স্তরের উপর নির্ভর

করে শ্রেণি-দুটির গঠন। মধ্যযুগ ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল, তখন ছিল ভূস্বামী আর ভূমিদাস। মধ্যযুগের শেষ ভাগের শহরগুলিতে আমরা দেখতে পাই দক্ষ কারিগর (গিল্ডসম্যান) ও তার অধীনে নানা শিক্ষানবিশ আর দিন মজুরদের। সপ্তদশ শতকে— ম্যানুফ্যাকচারার এবং ম্যানুফ্যাকচার শ্রমিক। উনিশ শতকে— বড় কারখানার মালিক আর সর্বহারা।

এটা নিতান্ত স্পষ্ট যে, এর আগে পর্যন্ত সকলের জন্য পর্যাপ্ত উৎপাদন করার মতো বিকাশ উৎপাদিকা শক্তির ঘটেনি, যাতে ব্যক্তিগত মালিকানা উৎপাদিকা শক্তিকে শৃঙ্খলিত করে তাকে বাধা দেয়। কিন্তু বৃহদায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের ফলে এখন, প্রথমত, পুঁজি আর উৎপাদিকা শক্তি এমন পরিসরে সৃষ্টি হয়েছে যা এ যাবৎ শোনা যায়নি। অল্পকালের মধ্যেই উৎপাদিকা শক্তির অসীম বৃদ্ধির উপায়-উপকরণ আজ মজুত। দ্বিতীয়ত, এইসব উৎপাদিকা শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে মুষ্টিমেয় বুর্জোয়াদের হাতে, পক্ষান্তরে বিপুল জনরাশি ক্রমাগত বেশি বেশি পরিমাণে পরিণত হচ্ছে সর্বহারায়। যে পরিমাণে বুর্জোয়াদের ধনদৌলত বাড়ছে ঠিক সেই পরিমাণেই বিপুল জনরাশির দুর্দশা এবং দুর্বিষহ অবস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তৃতীয়ত, এই মহাশক্তিশালী উৎপাদিকা শক্তিকে সহজেই বিপুল পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব। এর বৃদ্ধি ব্যক্তিগত মালিকানা এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থার পরিধিকে এতখানি ছাড়িয়ে গেছে এর ধাক্কা বারে বারে তীব্র আলোড়নে সমাজব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই এখনই ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করার সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে উঠেছে শুধু তাই নয়, তা হয়ে উঠেছে একেবারেই অপরিহার্য।

(চলবে)

ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : ফিরে দেখা

অজাতশত্রু রাজা হল যবে, / পিতার আসনে আসি / পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে / মুছিয়া ফেলিল রাজপুত্রী হতে—/সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে/ বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি।

পূজারিণী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অতীত যুগের ইতিহাস মূলত তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী রাজা-সুলতান-নবাবদের শৌর্য, বিজয়ের কাহিনি। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, যা আসলে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, এই ইতিহাসে তা স্থান পায়নি। ভারতের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সময়ে এসেই শুরু হয় ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার কাজ। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা সত্য ইতিহাস রচনার পরিবর্তে তাদের শাসন পাকাপোক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী করা, ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভকে দুর্বল করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তা শুরু করে। স্বাভাবিক ভাবেই সেই ইতিহাস হয়ে ওঠে বিকৃত ইতিহাস।

ভারতে ইতিহাস বিকৃতির সূচনা ব্রিটিশ শাসকদের হাতে

১৮১৭-তে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ জেমস মিল পরিকল্পনা মতো এই বিকৃত ইতিহাসের সূচনা করেন। ভারতীয় ইতিহাসকে তিনি হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ— এই তিনটি পর্বে ভাগ করেন। প্রথম দুটি ভাগ ধর্মের নামে হলেও তৃতীয় ভাগটি ধর্মের নামের পরিবর্তে শাসকদের নামে ‘ব্রিটিশ’ বলে উল্লেখ করা হয়। অথচ প্রথম দুটি হিন্দু এবং মুসলিম হলে তৃতীয় ভাগটিও ‘খ্রিস্টান’ হওয়া উচিত

ছিল। এই ভাবে ভাগের মধ্যেই শাসকের হীন উদ্দেশ্যমূলক মনোভাব স্পষ্ট। এই ইতিহাস বিচারে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ বাদ দিয়ে ধর্মীয় পরিচয়কেই রাজনৈতিক ক্ষমতার একমাত্র উৎস হিসাবে দেখানো হয়। শাসকদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক লড়াইকে উপনিবেশিক ইতিহাসবিদরা ধর্মীয় সংঘাত হিসাবে উপস্থিত করেন। যা ব্রিটিশের ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতিকে তত্ত্বগত ভাবে বৈধতা দেয়। অথচ হিন্দু ও মুসলিম রাজা-সুলতানরা কেউই মূলত ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকে রাজ্য শাসন করেছেন বিষয়টা এমন নয়। যে কোনও রাষ্ট্রই যেমন শ্রেণি-শোষণের ও দমন-পীড়নের হাতিয়ার— রাজতন্ত্রও তেমনই ছিল। হিন্দু রাজারা যেমন সকল প্রজাদের উপর শোষণের খাঁতাকল চালিয়েছে, তেমনই মুসলিম শাসকরাও তাই করেছে এবং এর ভিত্তি ধর্ম ছিল না। এই ঐতিহাসিক ইতিহাস বিচারপদ্ধতি মেনেই উপনিবেশিক আমলের দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ, দেশীয় সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি এবং ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী রাজনীতিবিদরা ভারতবাসীর সামগ্রিক ঐক্যবদ্ধ জাতীয় পরিচয়কে অস্বীকার করে পৃথক হিন্দু বা মুসলিম জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব হাজির করে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শাসক কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মকে ভোটের স্বার্থেই কাজে লাগাতে থাকে। জরুরি অবস্থার পরের নির্বাচনে কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, এত দিন আমরা সংখ্যালঘুদের স্বার্থ দেখে এসেছি, এ বার সংখ্যাগুরুদের স্বার্থ দেখব। বুর্জোয়া দলগুলির রাজনীতিতে ‘ভোটব্যাক্স’ রাজনীতি স্বাভাবিক হয়ে

ওঠে। এই ভোটব্যাক্স রাজনীতির কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা তৈরি হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে আসলে তোষণের রাজনীতি। বাস্তবে যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রকে যে কোনও ধর্মীয় কাজকর্ম থেকে দূরে রাখে। পরবর্তী সময়ে বিজেপি এবং আরএসএস এই বিকৃত ইতিহাসকে রাজনৈতিক মেরুকরণের কাজে পুরোপুরি ব্যবহার করতে থাকে। নির্দিষ্ট একটি ধর্মের শাসকদের এবং সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ খলনায়ক বানিয়ে সাধারণ মানুষের মনে স্থায়ী বিদ্বেষ তৈরি করতে থাকে। যার ফলে অনেক শিক্ষিত মানুষও, যাঁরা হয়তো ব্যক্তিগত ভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন নন, কিন্তু ইতিহাসের ততখানি খোঁজ রাখেন না, তাঁরাও ইতিহাসের বিকৃত প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। ভারতে থাকেন, আজ ভারতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ-বিভেদ যে বিকৃত রূপ নিয়েছে তা বোধহয় বরাবরই ছিল। সুস্থ স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষের মনে বার বার প্রশ্ন ধাক্কা দেয়— এই দীর্ঘ সময় ধরে উভয় ধর্মের মানুষ কি তা হলে পারস্পরিক বিদ্বেষ-বিভেদের মধ্যেই বাস করেছে? সাম্প্রদায়িকতার শেকড় কি সমাজের এমন গভীরে প্রোথিত যে দীর্ঘ পরিচর্যা তা এখন সমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে? এই বিরোধ কি স্বাভাবিক? এই বিরোধ থেকে বের হওয়ার কি কোনও উপায় নেই? এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর পেতে হলে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে ইতিহাসের বিজ্ঞানভিত্তিক বিচারে।

সাতের পাতায় দেখুন

জমিদারি বানাতে চায়

একের পাতার পর

দাবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে উপাচার্য ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের পক্ষে সংবাদমাধ্যমে সওয়াল করতে ভুললেন না। লক্ষ্মীয়া, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই সময় বলেন, “কেউ পেশি-শক্তির আশ্রয় নেবে, কেউ পেশি-শক্তির আশ্রয় নেবে।” সুশাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার দু’দিন পর যাদবপুরের একাংশে ‘টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং’-এর অস্তিত্বের সন্ধান পেয়ে হুঙ্কার দিলেন ‘জাতীয়তাবাদ-রাষ্ট্রবাদের সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না’ এবং জানিয়ে দিলেন, ‘রাখি পূর্ণিমার দিন যাদবপুরে গিয়ে ১০ হাজার কণ্ঠে বন্দেমাতরম গাওয়া হবে।’ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চত্বরে যে ভঙ্গিতে একজন বিধায়ক হুঙ্কার দিয়েছেন, যে ভাবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তাঁকে সমর্থন করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে ভাবে সব দেখেও নিষ্ক্রিয় থেকেছে, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীও যে ভাষায় কথা বললেন, তা থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে বিজেপির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দখলের কৌশল স্পষ্ট হয়ে যায়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজেপি-এবিভিপির রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে ২০২৬ সালের ১৯-২০ আগস্টের ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ রাখলে এর দীর্ঘমেয়াদি চরিত্রটি বোঝা যাবে না। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯, এবিভিপির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। সেখানে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি বিক্ষোভ দেখালে মন্ত্রীর উচ্চারণে তীব্র সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়। রাতে বিজেপি-এবিভিপির গেরুয়া বাহিনী ক্যাম্পাসে ঢুকে ছাত্রদের ইউনিয়ন রুমে ভাঙচুর চালায় এবং ছাত্রদের মারধর করে। এর সমর্থনে তৎকালীন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ যাদবপুরকে ‘দেশ-বিরোধী’ ও ‘কমিউনিস্ট-দের ঘাঁটি বলে আক্রমণ করে ‘বালাকোটের মতো সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’-এর দাওয়াই দেন। ২৩ সেপ্টেম্বর এবিভিপি মিছিল করে এসে আবার ক্যাম্পাস দখলের চেষ্টা করে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ৪ নম্বর গেটের সামনে ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে মানববন্ধন করেন। ৩ মার্চ ২০২৫-এ, ফের এবিভিপির সদস্যরা বাইরে থেকে ক্যাম্পাসে ঢুকে এআইডিএসও এবং এসএফআইয়ের পতাকা সরিয়ে এবিভিপির পতাকা লাগায় এবং তাদের পোস্টার ছিঁড়ে দেয়।

২০১৯ সাল থেকে ঘটে চলা ধারাবাহিক ঘটনাগুলির দিকে তাকালে দেখা যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘দেশ-বিরোধী’ শক্তির ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত করা, এবিভিপির সাংগঠনিক উপস্থিতি বাড়ানো এবং শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে ক্যাম্পাসের রাজনৈতিক দখল নেওয়াই বিজেপির একমাত্র উদ্দেশ্য। দেশের অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও বিজেপি-শাসিত রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজেপি-আরএসএস-এবিভিপি যে ভাবে ক্যাম্পাস দখলের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এই প্রবণতা তার থেকে ভিন্ন নয়। বিশেষত, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কেও একই ছকে দখলের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। মতপ্রকাশ, ভিন্নমত ও গণতান্ত্রিক বিতর্কের পরিসরকে সংকুচিত করে

ক্যাম্পাসে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই এই রাজনীতির অন্যতম লক্ষ্য। ফলে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে যে রাজনৈতিক মডেল প্রত্যক্ষ করা হয়েছে, যাদবপুরেও তার অনুরূপ পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় এক সভায় এবং শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহার মতো বিজেপির শীর্ষ নেতারা বিভিন্ন সময়ে সমগ্র যাদবপুরকে ‘অরাজকতা’ বা ‘দেশ-বিরোধী’ কার্যকলাপের ঘাঁটি হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে পরিকল্পিতভাবে এক ফ্যাসিবাদী হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক ভাষ্য তৈরি করার চেষ্টা করে গেছেন। এর থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় বিজেপি বামপন্থী, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ বা সরকারবিরোধী রাজনীতিকে গণতান্ত্রিক পরিসর দিতে চায় না। বরং ‘দেশবিরোধী’ তকমা দিয়ে আদর্শগত বিরোধী রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিসরকে খর্ব করার চেষ্টা করে।

সারা দেশে শিক্ষাকে কবরে পৌঁছে দেওয়ার কারিগর বিজেপি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অবস্থা, ছাত্রছাত্রীদের জন্য চোখের জল ফেলেছে। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয় গত ২০২৪ সালেও ভারতশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে মর্যাদা অর্জন করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রী বিশ্বময় নিজ নিজ ক্ষেত্রে আজও প্রতিষ্ঠা অর্জন করে চলেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গনকে আলোকিত করেছিলেন প্রথম উপাচার্য পদ্মশ্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ডঃ অমর্ত্য সেন, কবি শঙ্কর ঘোষ, সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন, ঐতিহাসিক ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য। যাদের যত্ন ও তত্ত্বাবধানে শিক্ষা সাহিত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আজ সুনামের সাথে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। এই ক্যাম্পাস আজও মুক্ত চিন্তা, আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও যুক্তিভিত্তিক আলোচনার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত, যা বিজেপি-আরএসএস-এর রাজনৈতিক আদর্শের

সাথে খাপ খায় না। তারা যে সর্বাত্মক অন্ধতা ও তাকে ভিত্তি করে যে আনুগত্য চায় তা যাদবপুরের ক্যাম্পাস স্বীকার করে না। তাই চূড়ান্ত অনৈতিকভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে বার বার আক্রমণ করে চলেছে তারা।

যাদবপুরের ঘটনাবলি থেকে উঠে আসা মূল প্রশ্ন হল, বিশ্ববিদ্যালয় কি স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তা, বিতর্ক এবং ভিন্নমতের নিরাপদ ক্ষেত্র হিসেবে থাকবে, নাকি শাসক দলের রাজনৈতিক আধিপত্য ও একমাত্রিক ‘দেশপ্রেমের’ হিন্দুত্ববাদী সংজ্ঞার অধীনে পরিচালিত হবে? প্রশ্নটি শুধু যাদবপুরের নয়, এটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি ছাত্র-শিক্ষক সহ বৃহত্তর জনগণের স্বার্থ ও তাঁদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। আশার কথা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের মানুষ এবং প্রাক্তনীদের পাশাপাশি রাজ্য জুড়ে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি এআইডিএসও, এসএফআই-এর মতো ছাত্র সংগঠন, যুব সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী এবং শিক্ষাপ্রেমী সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ফলে বিজেপির হিন্দুত্ববাদী-ফ্যাসিবাদী রাজনীতি এই মুহূর্তে চরম পর্য্যুদস্ত হয়েছে। সর্বস্তরের মানুষের এই প্রতিরোধই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, যাদবপুরকে হিন্দুত্ববাদী আধিপত্যের অধীনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা সফল হবে না।

তীব্র নিন্দা

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য তরুণকান্তি নস্কর এক বিবৃতিতে বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ আগস্ট শাসক বিজেপির মদতে আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র বহিরাগত গুন্ডারা যে ভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে, তাকে নিন্দা করার জন্য কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়। পুলিশ প্রশাসনের মদত ছাড়া এটা সম্ভব হত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা একযোগে যেভাবে এই হামলা প্রতিরোধ করেছেন তা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকেই রক্ষা করেছে। এর জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। একদিকে বিজেপি নেতা এবিভিপি-র সাথে বিজেপির যোগ নেই বলে দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছেন, অন্য দিকে যাদবপুরের বিধায়ক খোলাখুলি উচ্চারণ দিয়েছেন। রাজ্য প্রশাসন এখনও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। সুশাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া প্রশাসনের এই ভূমিকা অত্যন্ত নিন্দাজনক।

এই বিশ্ববিদ্যালয় সারস্বত চর্চায় রাজ্যে এক নম্বর ও দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে অবস্থান করে। দেশের যে কয়েকটি হাতে গোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে তার মধ্যে যাদবপুর অন্যতম। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর শাসক বিজেপির আক্রমণ বহুদিনের। পূর্বতন শাসক তৃণমূলের অবস্থানও একই ছিল। নির্বাচনী প্রচারাে এসে প্রধানমন্ত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়কে নিশানা করেছিলেন। আমরা এই ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে অবিলম্বে শাস্তির দাবি করছি।

নেতাজি মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদ এসইউসিআই(সি)-র

দক্ষিণ কলকাতায় নিউ আলিপুরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি ভাঙার বিরুদ্ধে ১৪ আগস্ট এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের মেহেদা, বুড়ারী, রামতারক, কোলাঘাট সহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ সভা হয়। বক্তারা রাজ্যের পালা পরিবর্তনের পর নেতাজি সহ বিভিন্ন মনীষীদের মূর্তি ভাঙা, মূর্তিতে কালিমা লেপন করা, নেতাজির নামাঙ্কিত রাস্তার নাম পরিবর্তন করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নামে করার নিন্দা করেন। নেতাজির মূর্তি ভাঙার বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রতিবাদের সামনে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী বাধ্য হয়ে বলেছেন, যারা এগুলো করছে তাদের কড়া শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। কোনও দৃষ্টিতে শাস্তি দেওয়ার তো দূরের কথা, গ্রেফতার পর্যন্ত করা হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর স্ববিরোধী ভূমিকার সমালোচনা করেন নেতৃবৃন্দ।

মেদিনীপুরে বন্যা

এআইডিএসও-র ত্রাণশিবির



বহুর বছর বন্যা যেন অভিজ্ঞ মেদিনীপুরের ভবিতব্যে পরিণত হয়েছে। ঘাটাল, সবং, পিংলা, ময়না, ভগবানপুর, পটাশপুর, দুবদা বেসিন প্রতি বছর বন্যায় বিপর্যস্ত হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মানুষের প্রত্যাশা পূরণ কি একেবারেই অসম্ভব কোনও দাবি? নাকি বন্যা রোখা সরকারের আর্থিক ক্ষমতায় কুলায় না?

কেলেঘাই ও কপালেশ্বরী বাগুই নদী সংস্কার, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান— এ সব যেন সোনার পাথরবাটি। বছরের পর বছর ভোটের জন্য প্রতিশ্রুতির বাইরে আর কিছু নয়। প্রতি বছর কেলেঘাই, বাগুই নদীর বাঁধ ভেঙে ভেতরের জমা জলে মানুষকে ভেসে যেতে হয়। হাজার হাজার মানুষ এক দুর্বিষহ জীবনের মধ্যে পড়েন দীর্ঘ কয়েক মাস। পানীয় জলের অভাব, খেতের ফসল ডুবে যাওয়া, পুকুরের মাছ ভেসে যাওয়া নিত্য বছরের ঘটনা। স্কুল-কলেজ অফিস তো বন্ধ থাকেই মানুষের জীবন জীবিকার ন্যূনতম উপায়টুকুও স্তব্ধ হয়ে যায়। অথচ বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও মূল নদী এবং তার শাখা নদীগুলির কোনও সংস্কার হয় না। জলনিকাশির উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। গ্রামের মানুষের বেঁচে থাকার সম্বলটুকু তলিয়ে যায় রাজনীতির ঘোলা জলে।

এই আবহেই এ বারও বন্যায় বিধ্বস্ত এলাকায় ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও সবং, ভগবানপুর, বাজকুল সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় দুর্গত মানুষের হাতে সংগৃহীত ত্রাণসামগ্রী তুলে দেয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির কোষাধ্যক্ষ কমরেড সুরজিৎ সামন্ত ও পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কমরেড সুমন মহাপাত্র। পূর্ব মেদিনীপুর এর ভগবানপুর বাজকুলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড লক্ষ্মণ ঘোড়াই ও রাজ্য কাউন্সিল সদস্য কমরেড অর্ঘ্য প্রধান।

ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ, নাগরিক কনভেনশন

ডায়মন্ডহারবার : ভোটার তালিকা থেকে অন্যায়াভাবে বাদ পড়া নাগরিকদের ভোটাধিকার পুনর্বহাল, ট্রাইব্যুনালের বিচার দ্রুত শেষ করা



এবং রেশন, আবাস যোজনা সহ সমস্ত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা অক্ষুণ্ণ রাখার দাবিতে ২০ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ডহারবারে ‘ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি’-র ডাকে বিশাল প্রতিবাদ মিছিলে शामिल হলেন সহস্রাধিক মানুষ।

এ দিন দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড ও ব্যানারে সুসজ্জিত, স্লোগান মুখরিত মহামিছিল পুরোনো হাসপাতাল চত্বর থেকে শুরু হয়ে মহকুমা শাসক দপ্তরে পৌঁছয়। নেতৃত্বে ছিলেন সমিতির মহকুমা সম্পাদক সঞ্জয় মণ্ডল, সভাপতি নাসিরউদ্দিন মীর এবং রাজ্য প্রতিনিধি বনমালী পণ্ডা।

সঞ্জয় মণ্ডলের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেন। তাঁরা দাবি তোলেন— বিচারাধীন নাগরিকদের কোনও ভাবেই রেশন, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার বা আবাস যোজনার মতো সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না এবং

ডিলিটেড পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় যেন ব্যাঘাত না ঘটে, প্রশাসনকে তা দেখতে হবে। মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সভায় বনমালী পণ্ডা বলেন, দেশের বৈধ নাগরিকদের হোল্ডিং সেন্টারে আটক রাখার কোনও নিয়ম নেই। সরকার নিজেই আইন মানছে না। তিনি বলেন, বৈধ নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় আনতে গড়িমসি করা হলে এবং প্রশাসনিক স্তরে সাধারণ মানুষের হয়রানি বন্ধ না হলে

আন্দোলন তীব্রতর রূপ নেবে।

দক্ষিণ দিনাজপুর : বালুরঘাট শহরের নাট্য মন্দিরে ২২ আগস্ট ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে চার শতাধিক মানুষের



উপস্থিতিতে একটি কনভেনশন হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন শঙ্কর ঘোষ। মোকসেদ সরকারকে সভাপতি এবং নন্দা সাহাকে সম্পাদিকা করে ২৫ জনের একটি জেলা কমিটি গঠিত হয়।

উত্তর ২৪ পরগণা : নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি কাণ্ডের ফলে



৩৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ যে দুর্গতি ও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতো বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে বসিরহাট মহকুমার লক্ষাধিক মানুষ রয়েছেন। অবিলম্বে বৈধ নাগরিকদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে বসিরহাটের টাউন হলে ২৪ আগস্ট সারা বাংলা ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে চার শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান বক্তা সমন্বয় সমিতির অন্যতম রাজ্য নেতা, এআইকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ বলেন, নিপীড়নের শিকার এই নাগরিকদের অধিকার ফিরে পাওয়ার একমাত্র রাস্তা এক্যবদ্ধ আন্দোলন। প্রতিনিধিরা কনভেনশনে নিজেদের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন। বিশিষ্ট জননেতা অজয় বাইন ও শিক্ষক হিরণ্ময় মণ্ডলকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। শেষে এক দৃপ্ত মিছিল বসিরহাট শহর পরিক্রমা করে।

স্মৃতিচারণ না ঘৃণাভাষণ

একের পাতার পর

নিহত হন মুসলমানদের হাতে। এই নিষ্ঠুর ঘটনার ফলেই পরবর্তীকালে দেশভাগ হয়।

ঘটনা কি সত্যিই তাই? ইতিহাসবিদদের অভিমত কিন্তু তা বলে না। ইতিহাসবিদ সুগত বসু, যিনি ওই সময়ের ইতিহাস নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন— ‘গোষ্ঠী সংঘর্ষের মতো মর্মান্তিক ঘটনায় নিহতের ধর্ম পরিচয় খোঁজায় আমি বিশ্বাসী নই।... এটুকু বলব, ১৯৪৬-এর সংঘর্ষ কখনওই একতরফা ছিল না। যেখানে যারা দুর্বল, তারা শিকার হয়েছিল। প্রথমে হয়তো হিন্দুরা মারা যান, চার দিনের হত্যালীলার শেষে বেশি মারা গিয়েছিলেন মুসলমানেরাই।’

তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তাঁরা বলেছেন, রাজ্যপাল পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। কিন্তু তার সুযোগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চকে শাসক দলের রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের কাজে ব্যবহার করবেন এ অধিকার তাঁর নেই।

রাজ্যপাল তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, স্বাধীনতার পরে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সময়ের ইতিহাস চর্চাকে অবহেলা করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকার এবং শিক্ষাবিদদের বিরুদ্ধে তিনি এই সময় নিয়ে নীরবতার অভিযোগ আনেন। দেখা যাক, তাঁর এই অভিযোগ কতটা সত্য।

বাস্তবে বহু ইতিহাসবিদ এই সময়ের ইতিহাস নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, যেমন কলকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সুরঞ্জন দাস, বাংলাদেশের ইতিহাসবিদ তাজিম মুর্শেদ। কলকাতার সেই গোষ্ঠী সংঘর্ষে প্রাণহানি নিয়ে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন ইতিহাসবিদ বরুণ দে-র তত্ত্বাবধানে জাপানি ইতিহাসবিদ নারিয়াকি নাগাজাতোও। ওই সময়ের ইতিহাস নিয়ে এই সব কাজের কোনওটিই রাজ্যপালের বক্তব্যের সত্যতা প্রতিফলিত করে না। কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, সেই সময়ের হিংসা ছিল একতরফা, শুধুমাত্র মুসলমানদের তরফে এবং হিন্দুরা শুধুই আক্রান্ত হয়েছিল। সুরাবর্দী যেহেতু সে সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, দাঙ্গা আটকানোর ব্যর্থতার দায় অবশ্যই তাঁর এবং তাঁর মন্ত্রিসভার উপর

এবিভিপি-র ভেঙে দেওয়া শহিদ বেদি গড়লেন এআইডিএসও কর্মীরা

১৫ আগস্ট কলকাতার হাজরায় আশুতোষ কলেজের সামনে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বীর শহিদদের উদ্দেশ্যে নির্মিত শহিদ বেদি ভেঙে দেয় এবিভিপি-র দুষ্কৃতীরা। ক্ষুদিরাম বসু ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবিও ছিঁড়ে দেয় তারা। এর প্রতিবাদে এআইডিএসও কলকাতা জেলা কমিটির নেতৃত্বে ওই দিন সন্ধ্যায় কলেজের সামনে এবং পরে ভবানীপুর থানার সামনে রাস্তা অবরোধ করেন ছাত্রছাত্রীরা। দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়ার দাবিতে ভবানীপুর থানায় স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ১৬ ও ১৭ আগস্ট সংগঠনের কলকাতা জেলার কর্মীরা

বর্তায়। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি দাঙ্গায় মদত দিয়েছিলেন— এ কথাও সত্য নয়।

এখন বিচার্য বিষয়, ৮০ বছর পরে হঠাৎ ইতিহাস চর্চার নামে এই ধরনের ঘৃণা চর্চার প্রাসঙ্গিকতা কী? ভিতরের গৃঢ় লক্ষ্য কি শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতচিহ্নকে খুঁচিয়ে দগদগে ঘায়ের স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনা? তাতে লাভটা কার হবে? সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের গরিব নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের জীবনের যেগুলি মৌলিক সমস্যা— অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থান— দেশের অসংখ্য মানুষের কাছে সেগুলি আজও অধরা। আজও আমাদের দেশের এক বিশাল সংখ্যক মানুষ নিম্ন আয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়। শাসক-শোষকের স্বার্থে দরিদ্র মানুষের এই মৌলিক চাহিদাভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় এক্যেকে শুরুতেই বিপর্যস্ত করে দেওয়া, তাদের সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেঙে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে তার আড়ালে শাসন ও শোষণকে আরও পাকাপোক্ত ও নিরাপদ করে তোলাই কি তার আসল উদ্দেশ্য নয়?

শাসক ও শোষক শ্রেণির এই অপচেষ্টা আমাদের দেশে নানা সময়ে নানা রূপে ফিরে এসেছে— নেলীর গণহত্যা, ভাগলপুরের দাঙ্গা থেকে ১৯৮৪-র শিখবিরোধী দাঙ্গা, উদাহরণ বহু। রাজ্যের পালাবদলের পর মাত্র চার মাসের মতো সময় অতিবাহিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, কখনও বিদ্যাসাগর-রামমোহনের মতো

নিজেরাই হাতে হাত মিলিয়ে শহিদ বেদিটি নতুন করে গড়ে তোলেন। ১৮ আগস্ট হাজরা মোড় থেকে ছাত্রদের একটি প্রতিবাদ মিছিল কলেজ গেটে পৌঁছয়। সেখানে শহিদ বেদিতে রক্তপতাকা উত্তোলন ও মাল্যদানের মাধ্যমে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।



নবজাগরণের মনীষীদের উপর আক্রমণ শানানো হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে বিচিত্র সব অভিযোগে প্রশ্নচিহ্নের সামনে ফেলা হচ্ছে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে পরিকল্পিতভাবে ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে লাগাতার কুৎসা। তারই সাথে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের নামে দেশভাগের সেই বেদনাময় স্মৃতিকে সমারোহের সাথে উদযাপন করা চলছে। সাম্প্রদায়িক ঘৃণার উৎসারীদের মনীষীতে রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যমে পালিত হচ্ছে পক্ষকালব্যাপী স্মরণগোষ্ঠসব। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নামে অপর একটি গোষ্ঠীর আবেগে খোঁচা দিয়ে রক্তাক্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার অপচেষ্টা খুব মোটা দাগেই সকলের চোখে ধরা পড়ছে— সে ঈদের ঠিক আগে গোহত্যা নিবারণে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে হোক বা সেই ১৯৩৭ সালে স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে গৃহীত সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে বন্দেমাতরম-এর পুরো সঙ্গীত স্কুলে-কলেজে বা সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানে গাওয়া বাধ্যতামূলক করার মধ্য দিয়ে হোক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হঠাৎ রাজ্যপালকে দিয়ে ইতিহাসের নামে অসত্যকে এইভাবে মদত দেওয়া এবং তা সরকারি উদ্যোগেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচারের উদ্যম অবশ্যই ঘৃণাচর্চার নামান্তর। সঙ্গত কারণেই রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একে খিঙ্কার জানিয়েছেন।

পাঠকের মতামত

জনতা পথে নামলেই শাসকের চোখে ভাসে ‘ষড়যন্ত্র’

শাসকরা সব সময়ই ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে ‘ষড়যন্ত্র’ খুঁজে পায়। দিল্লির যমুনা মস্তুরে গড়ে ওঠা ছাত্র-যুবদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ষড়যন্ত্র খুঁজে পেয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

দিল্লি রাজ্যে বিজেপির সভাপতি হর্ষ মালহোত্রা থেকে শুরু করে সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত, জাতীয় মুখপাত্র সিদ্ধার্থ যাদব সহ ওদের নানা মাপের নেতারা এই আন্দোলনকে বিরোধী দলগুলোর ‘উসকানি’ এবং ‘সংসদ অবরুদ্ধ করার চক্রান্ত’ বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এক ধাপ এগিয়ে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেছেন, যমুনা মস্তুরের এই বিক্ষোভের পেছনে ভারত-বিরোধী শক্তির হাত রয়েছে। একই সুরে সুর মিলিয়ে ছিলেন দলটির তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) সেলের প্রধান অমিত মালব্য।

শাসক দল ঘনিষ্ঠ সংবাদমাধ্যমের বড় অংশও দিন-রাত এই তত্ত্বই আওড়েছে যে ছাত্র-যুবদের আন্দোলনের পেছনে চিন, পাকিস্তান এমনকি মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনীর হাত রয়েছে। ২৬ দিন অনশন চালানো শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককেও তারা কখনও ‘চিনের দালাল’ আবার কখনও ‘ডিপ স্টেটের এজেন্ট’ বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু এই অভিযোগগুলি যে সত্য নয় তা গত ২৪ জুলাই ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্রের বক্তব্যে উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন, আন্দোলনে বিদেশি অর্থায়নের কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

দেশের বিভিন্ন আন্দোলনের ইতিহাস ফিরে দেখলে দেখা যাবে, প্রেক্ষাপট ও আন্দোলনের চরিত্র আলাদা হলেও বিভিন্ন সময় শাসক দল বা সরকার আন্দোলনকে প্রতিহত করতে দমন-পীড়ন নীতির পাশাপাশি ‘ষড়যন্ত্র’-এর তত্ত্বও হাজির করেছে। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে, উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি এবং কর্মপরিবেশের উন্নতির দাবিতে জোরালো শ্রমিক বিক্ষোভ হয়। হরিয়ানার গুরুগ্রাম থেকে শুরু হওয়া এই শ্রমিক আন্দোলন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নয়ডা, ফরিদাবাদ সহ পুরো দিল্লি-এনসিআর শিল্পাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক বৃহৎ শ্রমিক বিক্ষোভের রূপ নেয়। শ্রমিকদের দাবি পূরণ করার পরিবর্তে এ ক্ষেত্রেও শাসক দল বিজেপি সেই একই কৌশলী অপপ্রচারকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের শ্রমমন্ত্রী অনিল রাজভর বলেন, এই অসন্তোষের পেছনে কোনও ‘পাকিস্তান যোগসূত্র’ রয়েছে কি না তা তদন্তকারী সংস্থাগুলো খতিয়ে দেখছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বলেন, ‘বিদ্রোহের ও বিদ্রোহকারী উপাদানগুলো’ সম্ভবত রাজ্যে নকশাবাদের পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে। কোনও রকম উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই নয়ডার পুলিশ কমিশনার লক্ষ্মী সিং এই শ্রমিক বিক্ষোভকে, ‘অসং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং

আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত কর্মকাণ্ড’ বলে আখ্যা দেন। ২০২০-২১ সালের দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনেও অনুরূপ ঘটনা দেখা গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশ করা তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১৬ মাস ধরে কৃষকরা দিল্লির বুকে আন্দোলন করেন। দিল্লির প্রচণ্ড গরম, বৃষ্টি এবং হাড়কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে কৃষকদের দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই দেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। এই আন্দোলনকেও শাসক দলের নেতা-নেত্রীরা এবং সরকার ঘনিষ্ঠ সংবাদমাধ্যমের একটা বড় অংশ ‘অতি-বামপন্থীদের আন্দোলন’, ধনী কৃষকদের আন্দোলন, ‘টুকরেটুকরে গ্যাং’, ‘দেশবিরোধী শক্তির চক্রান্ত’ ও ‘বিদেশি ষড়যন্ত্র’ বলে দাগিয়ে দেওয়ার প্রবল চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কৃষকরা এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়নি।

শুধু বিজেপি নয়, ২০১১-১২ সালে আন্না হাজারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ‘ইন্ডিয়া এগেইনস্ট করাপশন’ বা দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের সময়ও কংগ্রেস নেতৃত্বাধীনে ইউপিএ সরকারের নেতারা এই আন্দোলনকে বিদেশি শক্তির ষড়যন্ত্র হিসেবে দাগানোর চেষ্টা করেছে। সংসদের উভয় কক্ষে এক বিবৃতিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-ও এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বে সিলমোহর দেন।

পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন পর্বে তৎকালীন সিপিএম সরকার এবং জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের প্ল্যাটফর্ম ‘সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি’ ও ‘ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি’র নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক গণআন্দোলনকে প্রতিহত করতে কৃষক-জনতার ওপর চরম রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের পাশাপাশি এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের বিরুদ্ধে একটি সুপারিকল্লিত এবং গভীর রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বলে প্রচার তুলেছিল। এমনকি এই আন্দোলনকে বহিরাগত ও মাওবাদীদের উসকানি এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের চক্রান্তও তারা বলেছে।

আসলে প্রেক্ষাপট বদলালেও প্রতিবাদের মুখে দাঁড়িয়ে সব জমানার সব শাসকেরই বয়ান বা হাতিয়ার অপরিবর্তিত থাকে। যে কোনও গণআন্দোলনে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি যে নিজ নিজ উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করবে, রসদ সরবরাহ করবে এর মধ্যে বিস্তৃত হওয়ার মতো কোনও বিষয় নেই। কিন্তু শাসকরা যে ভাবে কথায় কথায় দেশি-বিদেশি শক্তির ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব হাজির করছে, তা নিছকই আন্দোলনকে প্রতিহত করার একটা পুরনো কৌশল। ভেতর থেকে আঘাত করে গণআন্দোলনের কোমর ভেঙে দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস।

ইতিহাসে মানুষই চিরকাল শেষ কথা বলে। তারাই প্রগতির পতাকা বহন করে। প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলন বারবার আমাদের এ কথাই জানান দেয় যে— পার্লামেন্ট পুলিশ, মিলিটারি, আমলাতন্ত্র, বিচার ব্যবস্থা শেষ কথা নয়, শেষ কথা বলে জনগণ। সামরিক দস্ত বা বন্দুকের নল নয়, শেষ পর্যন্ত গণদেবতাই ইতিহাসের নীতি নির্ধারক হয়ে ওঠে।

জিশু সামন্ত, খানাকুল, হুগলি

৫ গুণেরও বেশি পঞ্চায়েত ট্যাক্স বৃদ্ধি

তীব্র প্রতিবাদ

এ আই কে কে এম এস-এর

সম্প্রতি রাজ্যে সরকার এক নির্দেশিকা জারি করে পঞ্চায়েত ট্যাক্স বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে, ভাল পঞ্চায়েত পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই ট্যাক্স বৃদ্ধির ঘোষণা। এত দিন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পরিবার পিছু গড় ট্যাক্স ছিল ২৩৩ টাকা। এ বারের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে এই ট্যাক্স বেড়ে পরিবার পিছু ন্যূনতম ১২০০ টাকা হবে। শুধু তাই নয়, নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, এবার থেকে পঞ্চায়েত ট্যাক্স বাকি রাখা চলবে না। তিন সপ্তাহের মধ্যে নির্ধারিত ট্যাক্স পরিশোধ না করলে তাদের নাম লাল তালিকাভুক্ত করা হবে এবং পঞ্চায়েত অফিসে ট্যাঙ্কি দেওয়া হবে। এর পর ১৫ দিনের মধ্যে ট্যাক্স পরিশোধ না করা হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা হিসাবে জরিমানা ধার্য করা হবে, এমনকি জেল পর্যন্ত হতে পারে। এলাকায় এলাকায় এই ট্যাক্স আদায়ের জন্য বিশেষ শিবির করা হবে। এলাকার বিধায়কদের বিষয়টিতে নজরদারি করতে বলা হয়েছে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে পঞ্চায়েত এলাকার কিছু রাস্তা, সেতু ও ফেরি ঘাটে টোল ট্যাক্স ধার্য করা হবে, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের বোর্ড গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় টাঙানোর জন্য কোম্পানি, সংস্থা ও ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হবে এবং কিছু পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করে অর্থ সংগ্রহে উৎসাহিত করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুদান ক্ষমতা বৃদ্ধিকরার জন্য আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ২৫২১ কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। এর জন্য কাদের উপর এই পঞ্চায়েতি ট্যাক্সের বোঝা চাপানো হচ্ছে? পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি প্রান্তিক কৃষক, ভাগচাষি, খেতমজুর, দিনমজুর— এক কথায় অতি দরিদ্র মানুষ। বাংলার গ্রামে গ্রামে চাষি ফসলের ন্যায় দাম না পেয়ে ক্রমাগত ঋণগ্রস্ত হচ্ছেন, খেতমজুর ও দিনমজুররা বছরে তিন-চার মাসের বেশি কাজ না পেয়ে ধারদেনায় ডুবে যাচ্ছেন, অনেকে আত্মহত্যা করছেন। সেই অসহায় মানুষদের উপরেই চাপানো হচ্ছে এই ট্যাক্সের এই বাড়তি বোঝা।

প্রশ্ন হচ্ছে পঞ্চায়েতবাসীদের ভাল পরিষেবা দিতে রাজকোষ থেকে বরাদ্দ টাকা বৃদ্ধি করা

যাচ্ছে না কেন? জনকল্যাণের জন্য বরাদ্দ করতে রাজকোষের টাকায় কি এতই সংকট? তাহলে রাজকোষ থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করে গুটিকয়েক ধনকুবেরের ব্যাংক-ঋণ মকুব করে দেওয়া হচ্ছে কেন? জনসেবক (!) এমএলএ, এমপি ও মন্ত্রীদের ভাতা এবং অন্যান্য বিপুল পরিমাণ সুবিধা বাড়ানো হচ্ছে কেন? রাজকোষের অর্থ নেতা-মন্ত্রীদের বিলাসে, সরকারি দপ্তরে দলীয় রঙ করার মতো অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করা হচ্ছে কেন? অপ্রয়োজনীয় খরচ বাঁচালে পঞ্চায়েত এলাকায় ভাল পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজকোষ থেকে খুব সহজেই বরাদ্দ করা যায়। তাহলেই আর পঞ্চায়েতবাসীদের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপানোর কোনও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তারা তা করবে না। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পে সরকারের বরাদ্দ টাকা দুর্নীতির কারণে কিভাবে লোপাট হয়ে যায়, তা কারও অজানা নয়। এই দুর্নীতি দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এই দুর্নীতি আটকানো বিজেপির পক্ষে অসম্ভব। বিজেপি পরিচালিত বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েতগুলির দুর্নীতির বহর সকলের কাছে জানা।

এ রাজ্যের বিজেপি পরিচালিত সরকারের বয়স এখনও ৩ মাসও হয়নি। এরই মধ্যে তারা একটার পর একটা জনবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। পঞ্চায়েতের ট্যাক্স বৃদ্ধি তার আরও একটা সংযোজন। রাস্তার গ্যাসের দাম কমানো সহ নির্বাচনের আগে বিজেপির নেতারা জনকল্যাণের জন্য যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এসে তা একটার পর একটা ভঙ্গ করে চলেছেন। তারা জনগণের ঘাড় ভেঙে কর্পোরেটের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যস্ত। আসলে বিজেপি সরকার হল কর্পোরেটের সরকার, নিপীড়িত গরিব মানুষ বা আমজনতার সরকার নয়।

অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজুর সংগঠন (এআইকেকেএমএস) পশ্চিমবঙ্গ কমিটির পক্ষ থেকে পঞ্চায়েতের এই ট্যাক্স বৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস এই অযৌক্তিক ও অন্যায ট্যাক্সবৃদ্ধির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তোলার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পঞ্চায়েতবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

দলীয় নিয়ন্ত্রণের পুরনো ধারা

একের পাতার পর

বিবেচনা করে না। তৃণমূল তো স্কুলের গণ্ডি না পেরোনো দলীয় বিধায়কদেরও বসিয়েছিল কলেজ গভর্নিং বডিতে। এমনকি তারা রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীকে বসানোর জন্য বিধানসভায় আইন পাশ করিয়েছিল। ফলে সরকারে যে শাসকই আসুক না কেন শিক্ষার উপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ কয়েমের অপচেষ্টা চলছেই। এতে শিক্ষার পরিবেশ ভুলুগুটিত

হচ্ছে, স্বাধিকারের উপর হস্তক্ষেপ চলছেই। শিক্ষাদারদি জনগণ ও ছাত্রছাত্রী-শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবি— কলেজগুলির শিক্ষার পরিবেশ ও মান বজায় রাখতে অবিলম্বে দলীয় বিধায়ক ও সাংসদদের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষাবিদদের সভাপতি পদে বহালের ব্যবস্থা হোক।

আমরা এই কালো নির্দেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানাই।

ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

তিনের পাতার পর

ধর্মাস্তুরণ সম্পর্কে বিবেকানন্দের বক্তব্য

দীর্ঘ সামন্তী ব্যবস্থা জুড়ে রাজার পরিবর্তনের সঙ্গে রাজধর্ম বদলেছে। পুরনো ধর্মকে মুছে ফেলা হয়েছে। তার প্রভাবে প্রজাদের ধর্মেরও পরিবর্তন ঘটেছে। এক কথায়, রাজার ধর্মই হয়েছে প্রজার ধর্ম। তা কখনও তরবারি বা রাজশাসনের জোরে, কখনও ভালবাসায়। মৌর্য সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান ভারতের অধিকাংশ অংশে, এমনকি ভারতের বাইরেও একটি বিরাট অংশে বৌদ্ধ ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। মনে রাখতে হবে, তখন এখনকার মতো ভারতের নির্দিষ্ট কোনও ভৌগোলিক সীমারেখা ছিল না। পরবর্তী কালে গুপ্ত যুগে এসে হিন্দু ধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্যধর্ম রাষ্ট্রীয় প্রধান ধর্মে পরিণত হয়। খ্রিস্টপূর্বের অজাতশত্রু শাসনে কিংবা বহু পরে বাংলায় শশাঙ্কের শাসনে দেখা যায় বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব এবং শৈব তথা হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা। এই ভাবেই চলেছে।

ভারতে মুসলমান অভিযানের পরও সেই একই জিনিস ঘটে। রাজধর্ম হিসাবে ইসলাম ধর্মের প্রসার শুরু হয়। যদিও পাঠান ও মুঘল শাসকরা ভারতে গোটা মধ্যযুগ ধরে কয়েক শতকের স্থায়ী সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মের বিরাট প্রসার ঘটেনি। সাধারণ মানুষের ধর্ম পরিবর্তন যদি এই শাসকদের উদ্দেশ্য হত, তবে এই দীর্ঘ সময়ে মুসলমানরা হয়ে দাঁড়াত সংখ্যাগুরু। তা হয়নি। ধর্মপরিবর্তন যতটা ঘটেছে তা-ও তরবারির জোরে সম্ভব হয়েছে বলে এমনকি বিবেকানন্দও মনে করতেন না। তিনি মনে করতেন, বর্ণাশ্রম প্রথার জের হিসাবে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নিম্নবর্ণের মানুষের ওপর চলা সামাজিক অত্যাচার ও অস্পৃশ্যতা একটা অংশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের এবং আগ্রাসী হিন্দুত্বের উৎপীড়ন বৌদ্ধদের একাংশের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণ। বাস্তবে এটাই ইতিহাস।

রামের জন্মস্থানে মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরির যে অভিযোগ বাবর সম্পর্কে হিন্দুত্ববাদীরা তোলেন তার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যে সময় রামমন্দির ভাঙা হয়েছে বলা হচ্ছে, অর্থাৎ আল হিজরি ৯৩৫, সেই সময় বাবর তার ছেলে হুমায়ুনকে একটি চিঠিতে লিখেছেন— ‘হিন্দুস্তানের জনগণের মন জয় করার জন্য গোহত্যা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। অন্যান্য ধর্মের মন্দির বা ভজনালয়গুলো অপবিত্র করো না। শিয়া-সুন্নি ভেদাভেদ করো না, ওটি ইসলামের দুর্বলতা। তরবারির জোরে নয় দয়ার দ্বারা ইসলামের প্রচার করো।’ (দ্য সেকুলার এম্পারার বাবর, সুরিন্দার কাউর ও তপন সান্যাল, পৃ. ৬৫-৬৬)। বাবরনামা থেকে স্পষ্ট হয়, পরবর্তী মুঘল সম্রাট আকবরের বিখ্যাত উদারনীতির মূল নৈতিক বনিয়াদটা বাবরেরই অবদান।

হিন্দুত্ববাদীরা মুঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে মেবারের রানা প্রতাপের লড়াইকে স্বাধীনতার লড়াই বলে দেখান। অথচ স্বাধীনতা বলতে আজ আমরা যা বুঝি, স্বাধীনতার সেই ধারণা সে সময়ে ছিল না। ওই স্বাধীনতা ছিল রাজার, প্রজাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল না। তাই তাঁরা এটা বলেন না যে, প্রতাপের সেনাদলে ও সেনাপতিদের মধ্যে কতজন মুসলিম ছিলেন। তাঁর প্রধান সেনাপতিদের অন্যতম ছিলেন শের শাহ সুরির বংশধর আফগান সর্দার

হাকিম খান সুরি। তাঁর অধীনে ৮০০ জনের এক আফগান বাহিনী মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। আবার আকবরের প্রধান সেনাপতিই ছিলেন হিন্দু মান সিংহ। যশোবন্ত সিংহ ছিলেন আওরঙ্গজেবের অন্যতম প্রধান সেনাপতি। আর মোগল সম্রাটদের শক্তি কারা ছিলেন? রাজপুতরা নয় কি? অম্বর, যোধপুর, এমনকি করণ সিংহ-জগৎ সিংহদের সময়ে মেবার কি মোগল মনসবদারি ছিল না? বাবর দিল্লি জয় করেছিলেন কোনও হিন্দুকে হারিয়ে নয়, ইব্রাহিম লোদিকে হারিয়ে। তাঁকে এ দেশে আহ্বান করে এনেছিলেন আর এক হিন্দু— রানা সঙ্গ। একে কি মুসলমান রাজার বিরুদ্ধে হিন্দু রাজার লড়াই বলা যায়? বাস্তবে এর চরিত্র ছিল সামন্ততান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক। ধর্ম নয়, রাজ্যবিস্তার এবং রাজ্য রক্ষার লড়াই-ই ছিল মূল কথা। ইতিহাসের এ সব তথ্য হিন্দুত্ববাদীরা দেশের মানুষের সামনে সচেতন ভাবে উত্থাপন করেন না।

উৎপীড়নের চরিত্র ছিল রাজতান্ত্রিক

মধ্যযুগে, মুঘল আমলে অত্যাচার কি হয়নি? হয়েছে। তবে সে উৎপীড়নের চরিত্র রাজতান্ত্রিক— ধর্মীয় নয়। রাজা, নবাব, সুলতান— কে অত্যাচার করেনি? অত্যাচার কি কেবল মুসলমান নবাবরাই করেছে? হিন্দু রাজারা করেনি? বৌদ্ধদের ওপর হিন্দু রাজারা কি ব্যাপক অত্যাচার চালায়নি? গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক প্রচণ্ড অত্যাচারী বলেই পরিচিত ছিলেন। যে শিবাজিকে হিন্দুত্ববাদীরা আদর্শ হিন্দু রাজা বলে প্রচার করেন সেই শিবাজির সুরাট অভিযানের বীভৎস অত্যাচার ইতিহাসের পাতাতেই রয়েছে। মারাঠা বর্গীদের বঙ্গ বিজয়ের পথে কয়েক লক্ষ মানুষের হত্যা, নির্বিচার লুণ্ঠতরাজের কাহিনি তো আজও প্রবাদ হয়ে আছে (‘ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল, বর্গি এল দেশে’)। তারাও ছিল হিন্দু, তার নেতা ভাস্কর পণ্ডিত।

ইতিহাসবিদদের অনেকের ইতিহাস-দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী ঝোঁক মিশে থাকায় ইতিহাসের উপস্থাপনাটাও হয়ে পড়েছে একপেশে। পলাশির যুদ্ধে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন মিরজাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি অভিজাতরা। অথচ কেবল মিরজাফরই বেইমানির প্রতীক হিসেবে পরিচিত হয়ে গেলেন। তুর্ক, আফগান বা মুঘলদের ভারত বিজয়কে যারা মুসলমানদের জয় বলছেন তাঁরা কি ব্রিটিশের ভারত বিজয়, কিংবা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরদেশ দখলকে খ্রিস্টানদের বিজয় বলবেন? নাকি তা সাম্রাজ্যবাদী ওপনিবেশিকতা?

সাম্প্রদায়িকতা পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল স্তরের বৈশিষ্ট্য

বাস্তব হল, দীর্ঘ মুসলমান শাসনের ইতিহাসকে যদি আমরা সেই সময়ের সাপেক্ষে এবং তার রাজতান্ত্রিক চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করি তবে বিচারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মনে রাখতে হবে ধর্মীয় বিদ্বেষ তথা সাম্প্রদায়িকতা চরিত্রে পুঁজিবাদী তথা ধনতান্ত্রিক। পুঁজিবাদ বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করে তার প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়ে মুমূর্ষু তথা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ার পরই সাম্প্রদায়িকতা নামক সামাজিক ব্যাধির জন্ম। তাই গজনির সুলতান মাহমুদকে লুণ্ঠেরা বলাটাই সঙ্গত। হিন্দু মন্দির লুণ্ঠ করেছিলেন বলে তাঁকে হিন্দু বিদ্বেষী বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বলে দেগে দেওয়া হবে ঐতিহাসিক। সুলতান মাহমুদের ভারত

অভিযানের পেছনে ধর্মীয় মনোভাবের আলাদা কোনও উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিজিত অঞ্চলগুলিতে ধর্মপ্রচারেরও কোনও প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বর্তমান ভারতের বড় বড় মন্দিরগুলির সম্পদের বিশালতা দেখলেই বোঝা যায় সে দিনও সোমনাথ সহ বড় বড় মন্দিরগুলি কী বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিল! সেই সম্পদের লোভেই বিদেশি শাসকরা বারবার মন্দির আক্রমণ করেছে, কোনও রকম ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকে নয়। সুলতান মাহমুদ শুধু হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধেই অভিযান চালাননি, মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধেও অভিযান চালিয়েছেন। মুক্তির বিনিময়ে তাঁদের কাছ থেকে অর্থ লাভ করেছেন। যেমন পরাজিত হিন্দু রাজাদের কারও কারও কাছ থেকেও অর্থ লাভ করেছেন। নেহেরু তাঁর ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়াতে লিখেছেন, সুলতান মাহমুদ যা করেছেন, তিনি মুসলমান না হয়ে অন্য কোনও ধর্মাবলম্বী হলেও তাই করতেন। সুলতান মাহমুদ তাঁর রাজত্ব এবং সেনাবাহিনীর খরচের উৎস হিসাবেই বার বার ভারত অভিযান চালিয়েছেন— যে সেনাবাহিনীকে তিনি এমনকি মধ্য এশিয়ায় তার সহধর্মী মুসলমানদের বিরুদ্ধেও মোতায়েন করেছিলেন। এগুলি যুক্ত সেই সময়ের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে, ধর্মের সঙ্গে নয়।

মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধর্মীয় স্থান এবং সোমনাথ মন্দিরে অভিযান, মন্দির ভাঙুর, বিগ্রহের ক্ষতিসাধনের যে অভিযোগ কিছু ভারতীয় ও ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এবং রাজনীতিক করেছেন, তাতে মুসলিম বিদ্বেষ যতটা দেখানো হয়, বাস্তব অবস্থা ও সত্যতা ততটা নয়। মন্দির যখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়, অর্থভাণ্ডার হিসেবে আকর্ষণীয় হয়, তখন ভাঙুর ও বিগ্রহের ক্ষতিসাধন অসম্ভব নয়। বিগ্রহের পেটে সোনাদানা, অলঙ্কার লুকিয়ে রাখা তখন প্রচলিত রীতি ছিল। যার ফলে বিগ্রহের ভাঙুর ও ক্ষতিসাধন হওয়া স্বাভাবিক।

কলহনের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘রাজতরঙ্গিনী’তে দেখা যায়, কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হর্ষদেব মন্দিরের সম্পদ লুট করার জন্য ‘দেবোৎপাটন-নায়ক’ নামের একটি বিশেষ দফতর বা পদ তৈরি করেছিলেন। কলহনের বর্ণনা অনুযায়ী রাজ্যের প্রায় প্রতিটি শহরের মন্দিরই তার সেনাপতির মাধ্যমে লুণ্ঠিত বা ক্ষতিগ্রস্ত ছিল।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যেমন মধ্যযুগকে ভারতের হিন্দুদের উপর মুসলমানদের জাতিগত বা সম্প্রদায়গত শাসন বলে, তেমনই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও একে মুসলমানী শাসন বলে গর্ব অনুভব করে। ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রচনা দেখায়, সুলতান-বাদশাদের শাসন মানে হিন্দুর ওপর মুসলমানের জাতিগত বা সম্প্রদায়গত শাসন। বাস্তবটা কি তাই? বাস্তব হল, সম্রাট অশোক, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা সুলতান আলাউদ্দিন কিংবা বাদশাহ আওরঙ্গজেব, সকলেই ছিলেন শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি। সম্রাট অশোক কি সব বৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রজাদের কর মকুব করেছিলেন? কিংবা চন্দ্রগুপ্ত হিন্দু প্রজাদের? নাকি আওরঙ্গজের মুসলিমদের কর মকুব করেছিলেন? আর যে জিজিয়া কর সম্পর্কে হিন্দুত্ববাদীরা আওরঙ্গজেবকে কাঠগড়ায় তোলে সেই জিজিয়া কর কী ছিল? দিল্লির সুলতানি আমলে প্রথম এই কর চালু করা হয়। মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৬৪ সালে এই কর তুলে নেন। ১৬৭৯ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব আবার তা চালু করেন। এটা ছিল অমুসলিমদের ওপর ধার্য

করা একটি বার্ষিক বিশেষ কর। এর বিনিময়ে রাষ্ট্র অমুসলিমদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, ধর্মপালনের স্বাধীনতা এবং সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিত। এই কর যারা দিত তাদের সুরক্ষিত নাগরিক বলা হত। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, দরিদ্র এবং সন্ন্যাসীরা এই করের আওতার বাইরে থাকত। এ কথা সত্য যে, তিনি জীবনযাপনে ইসলামের গোঁড়া অনুসারী ছিলেন। শাসক হিসাবে হিন্দু রাজা এবং প্রজাদের ওপর অত্যাচারও হয়তো তিনি করেছেন। কিন্তু আলাদা করে তাঁর হিন্দু বিদ্বেষের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কি? জিজিয়া চাপানোর উদ্দেশ্য যদি হিন্দু বিদ্বেষ হত তবে ক্ষমতা আরোহণের প্রায় ২০ বছর পর তিনি এই কর চাপালেন কেন? বাস্তবে একটানা যুদ্ধ এবং বিশাল সাম্রাজ্যের ব্যয় মেটানোর জন্য রাজকোষে নতুন আয়ের উৎসের প্রয়োজন থেকেই কার্যত এই কর চাপানো হয়। আবার তাঁর শাসনে মুসলিমদের ‘জাকাত’ বলে একটা কর দিতে হত, অ-মুসলিমদের ওপর চাপানো হত না, সে কথা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বলেন না।

হিন্দুত্ব একটি মিশ্র সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ভারততীর্থ’ কবিতায় বলেছেন— ‘হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—/ শক-ছন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন। ...’ যে বিশুদ্ধ হিন্দুত্বের কথা বিজেপি কিংবা সংঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদী নেতারা প্রচার করেন, বাস্তবে তা কোথাও নেই, কোথাও ছিল না। শত শত বছর ধরে অসংখ্য জাতি ভারতীয় জীবনধারণের সঙ্গে এসে মিলেছে, মিশেছে। সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে হোক বা অন্য কোনও কারণে তারা এ দেশে এসে বাস করেছে, এ দেশেরই মানুষ হয়ে গিয়েছে।

খ্রিস্টাব্দের সূচনার সময়কাল থেকে কণিষ্ক সহ কুষাণ সম্রাটরা উত্তর ভারত জুড়ে রাজত্ব স্থাপন করেন এবং দীর্ঘ সময় শাসন করেন। মূলত চীনের একটি শক্তিশালী যাযাবর ইউয়েইচি সম্প্রদায়ের একটি শাখা হিসাবে ভারতে প্রবেশ করলেও তাঁরা আর ফিরে যাননি। কুষাণ সাম্রাজ্য আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তানের কিছু অংশ, কাশ্মীর এবং উত্তর ভারতে বিস্তৃত ছিল। কুষাণরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে ধীরে ধীরে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে মিশে যায়। আজ আর ভারতীয় সমাজে কুষাণদের আলাদা করে চেনবার কোনও উপায় নেই। ঠিক একই রকম ভাবে গ্রিক, শক ও পার্থিয়ানরাও ভারতীয় জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মানুষের ও তাদের সংস্কৃতির স্বাভাবিক মিশ্রণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে।

একই রকম সামাজিক মিশ্রণ এ দেশে গত প্রায় এক হাজার বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে দেখা গেছে। দুই ধর্মের মানুষের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়েও ভারতীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘মুসলমানেরা পুরুষানুক্রমে জমিয়া ও মরিয়া এ দেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল। মুসলমান রাজত্ব ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, বাইরে তার মূল ছিল না। তাই মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায় পরস্পর জড়িত হইয়াছিল এবং পরস্পরের আদানপ্রদানের সহস্র পথ ছিল’ (সমাজ)।

চলবে

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে মণিপুরের শ্রমিকদের সভা

মণিপুরে ন্যাশনাল হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডের (এনএইচপি) অধীনস্থ লোকটাক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ঠিকা শ্রমিক ইউনিয়নের (এআইইউটিইউসি এবং এআইপিএফ অনুমোদিত) উদ্যোগে ১৩ আগস্ট এ আই ইউ টি ইউ সি-র প্রয়াত সভাপতি এবং এ যুগের অন্যতম মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের পঞ্চাশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মণিপুরের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতির জন্য উদ্যোক্তারা আলোচনা সভাটি অনলাইনে আয়োজন করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সহ সভাপতি কমরেড স্বপন ঘোষ। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সমর সিনহা।

মূল বক্তা কমরেড স্বপন ঘোষ বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলায় কমরেড শিবদাস ঘোষের অনন্য সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন। চূড়ান্ত সমস্যা জর্জরিত এই সমাজে শ্রমিক শ্রেণির কর্তব্য এবং সেগুলি জানার জন্য কেন বর্তমান পরিস্থিতিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষাগুলি চর্চা ও আয়ত্ত করা দরকার, সে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করেন।

আগামী দিনে মণিপুরে বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সমবেত শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

রামপুরহাটে জনমতের চাপে ‘নেতাজি সুভাষ রোড’-এর নাম অপরিবর্তিত রাখতে বাধ্য হল প্রশাসন

বীরভূমে রামপুরহাটের বিজেপি বিধায়ক গত ৬ জুলাই একতরফা ভাবে পাঁচমাথা থেকে বনবানিয়া সাঁকো পর্যন্ত ‘নেতাজি সুভাষ রোড’-এর নাম পরিবর্তন করার ঘোষণা করে দেন। নেতাজির নাম মুছে তিনি রাস্তাটির নতুন নাম রাখেন ‘শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড’। এই মর্মে বিভিন্ন জায়গায় হোর্ডিংও বসিয়ে দেন। ঘটনার পরেই এসইউসিআই(সি) প্রতিবাদে রাস্তায় নামে। সাধারণ মানুষ বিধায়কের এই সংকীর্ণ দলীয় প্রচেষ্টায় স্তম্ভিত হয়ে যান।

এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে নেতাজি অনুরাগী সর্বস্তরের মানুষকে প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আবেদন করা হয়। রাস্তার নাম অপরিবর্তিত রাখার দাবিতে পোস্টার, দেওয়াল লিখন, স্বাক্ষর সংগ্রহ, পথসভা চলতে থাকে। ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সংগঠিত করে মহকুমা শাসকের দফতরে বিক্ষোভ দেখায়, ডেপুটেশন

দেয়। নাগরিক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে আন্দোলনের চাপে এবং সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের সামনে পড়ে ১৪ আগস্ট প্রশাসন নাম পরিবর্তনের অপচেষ্টা থেকে পিছিয়ে আসে। তারা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত হোর্ডিংগুলি সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়।

আন্দোলনের এই জয়ে প্রতিবাদী জনসাধারণকে অভিনন্দন জানিয়ে দলের বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক মদন ঘটক ১৪ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, এই জয় সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রতিবাদেরই ফল। নেতাজি সহ আপসহীন ধারার বিপ্লবী এবং নবজাগরণের প্রাণপুরুষ রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল প্রমুখ মহান ব্যক্তিদের কালিমালিপ্ত করার যে ষড়যন্ত্র বিজেপি অব্যাহত রেখেছে তার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

জয়নগর-১ ব্লকে বিক্ষোভ এসইউসিআই(সি)-র

মাসাধিক কাল ধরে অতি বর্ষণে জয়নগর-১ ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের ধানজমি, পুকুর, সবজি বাগান, রাস্তাঘাট এমনকি ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়। নিকাশি ব্যবস্থা ঠিকমতো না থাকায় বিশেষত রাজাপুর করাবেগ, খাকুড়া-জাঙ্গালিয়া, দক্ষিণ বারাসাত সহ ব্লকের বহু অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বর্তমানে গ্রাহকদের না জানিয়েই বহু রেশন কার্ড বাতিল করা হচ্ছে। কীসের ভিত্তিতে কার্ডগুলি বাতিল হচ্ছে ফুড ইন্সপেক্টর বা বিডিও তার কোনও সদুত্তর দিতে পারছেন না।



এই অবস্থায় জয়নগর-১ ব্লক এসইউসিআই(সি)-র উদ্যোগে অবিলম্বে ব্লকে উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ডুবে যাওয়া সবজি, আমন ধানের জন্য চাষিদের ক্ষতিপূরণ, ভেসে যাওয়া পুকুরগুলিতে চাষের জন্য মাছ সরবরাহ, সর্বত্র জমি, পুকুর, ডোবা, নয়ানজুলি বোজানো বন্ধ করা ও যথেষ্ট রেশন কার্ড বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে কয়েকশো মানুষের এক মিছিল বিডিও অফিসে যায়। পরে সহদেব কয়ালের নেতৃত্বে দিব্যেন্দু মুখার্জী, কানাই হালদার, গৌর হালদারের এক প্রতিনিধিদল বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য গোপাল সাহ ও হারু দাস, শওকত আলি মোল্লা।

যাদবপুর সহ
শিক্ষাক্ষেত্রে
আরএসএস-
এবিভিপি-র
তাণ্ডবের
প্রতিবাদে
কলকাতায়
বামপন্থী ছাত্র
সংগঠনগুলির
ধিকার মিছিল।
২৪ আগস্ট



যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা ও মনীষীদের লাগাতার অবমাননা— বুদ্ধিজীবী মঞ্চের প্রতিবাদ

শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও সান্টু গুপ্ত ২১ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, ১৯ আগস্ট রাতে এবং তার পরদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এবিভিপি দুষ্কৃতীরা যে ভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে, অবাধে মহিলা ও ছাত্রীদের গালিগালাজ করেছে তা গণতন্ত্রের কলঙ্ক এবং পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তা বরদাস্ত করে না। গণতন্ত্রপ্রিয় ও বামপন্থী সংগঠনগুলি যে ভাবে এর প্রতিরোধের ডাক দিয়েছেন, বুদ্ধিজীবী মঞ্চ তার জন্য তাদের অভিনন্দন জানিয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ইতিমধ্যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, সুকান্ত সহ মনীষী ও প্রখ্যাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও মিথ্যা প্রচার চলছে, তেমনই চলছে তাঁদের মূর্তি ভাঙা, বিকৃত ও উৎপাটিত করার হুমকি। সরকার ও প্রশাসন নীরব দর্শক, কার্যত পরোক্ষ

প্রশ্রয়দাতা। যাদবপুরে মহামতি লেনিনের মূর্তি ভাঙার হুমকি ও উদ্যোগ অব্যাহত আছে। এই সমস্ত কাজকে মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতা ধ্বংসকারী অপকর্ম বলে অভিহিত করেছে মঞ্চ।

মঞ্চ বলেছে, পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার শিল্প-সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ করে যে ভাবে রুচিহীন গেরুয়াকরণ চলছে ও শাসক দলের ট্রেড ইউনিয়নের কার্যালয়ের নামে শিল্প সংস্কৃতি নাটক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ঐতিহ্যবাহী স্থলের অবমাননা করা হচ্ছে তা রুচিশীল কোনও মানুষ মেনে নিতে পারেন না।

সত্য ও সংস্কৃতি বিবর্জিত এই সব অশুভ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও নাট্যকর্মীদের যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ উদ্যোগ শুরু হয়েছে তার প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করি।

ইন্দাসে খুনিদের শাস্তির দাবি বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার করিশুণ্ডায় শিক্ষা আন্দোলনকারী এক যুবকের বাবা শেখ মহম্মদ মাহফিজকে ১৫ আগস্ট বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা নৃশংস অত্যাচার করে খুন করে। এর প্রতিবাদে এসইউসিআই(সি) বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২০ ও ২১ আগস্ট বাঁকুড়া শহর, সোনামুখী, ছাতনা, শালতোড়া, লক্ষ্মণপুর ইত্যাদি জনবহুল এলাকায় প্রতিবাদ সভা হয়।

স্মারকলিপি দিল সিপিডিআরএস : শেখ মহম্মদ মাহফিজের হত্যার প্রতিবাদে সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে ২১ আগস্ট বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের দপ্তরে দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দ্রুত এই নৃশংস ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, নিহতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও তাঁর ছেলে-মেয়েকে চাকরি, এলাকায় সম্প্রীতি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখার উদ্যোগ, গ্রামের প্রাথমিক স্কুল অবিলম্বে সংস্কার ও সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা করার দাবি জানানো হয়। প্রতিনিধিত্ব করেন প্রদীপ দাস, আইনজীবী হরিদাস ব্যানার্জী, বেণীমাধব মিত্র, ফাল্গুনী ব্যানার্জী, স্বপন নাগ প্রমুখ।

গণদাবী পড়ন ও গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - ১৫০ টাকা
সডাক - ১৬৫ টাকা